দৈনিক ইনকিলাব

20 MAR 1988
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৮ ... কলাম ১ ... ...

000179

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বাংলা ভাষার প্রয়োগ সর্বস্তরে

শীত ঋতুর প্রাক্কালে হেমন্ত যখন বাংলার কৃষকের ঘরে করাঘাত করে তখন কৃষককুলে এক অভাবনীয়-অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। গ্রামগুলি তখন কর্মচাঞ্চল্যে ভরে উঠে। গ্রামের ঘরে তখন নবান্নের জোয়ার। উঠোনগুলি তখন থরে থরে ধানের বোঝায় ভরে থাকে। প্রতিটি ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নতুন ধানের পিঠা, মুড়ি, চিড়া, খৈ খাওয়ার আনন্দে মেতে থাকে। গ্রামে সেই সময় কোন লোক অনাহারে থাকে না। কমবেশী প্রত্যেকের ঘরেই তখন ভাত থাকে, মুখে থাকে হাসি আর শরীরে থাকে বল। লক্ষ্য করেছি, গ্রামের সেই আনন্দ কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় না। ২/১ মাস বড় জোর আনন্দ আর উচ্ছ্বাস বইতে থাকে। তারপর আবার লোকজন ভুগতে থাকে অভাব-অনটন আর সেই সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদে।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষা নিয়ে ঠিক এরূপই খেলা চলতে থাকে। আমার জানামতে, পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যে দেশে মাতৃভাষা ব্যবহার করার অধিকার আদায় করতে সেই দেশবাসী রক্ত দিয়েছে। এমন একটি দেশও নাই, যেই দেশে মাতৃভাষা ব্যবহার করার জন্য সরকারকে আইন করতে হয়েছে। পৃথিবীতে হাতে গোনা ২/১টি দেশ ছাড়া প্রায় প্রতিটি দেশই অপর কোন রাষ্ট্রের অধীনস্থ ছিল। কৈ তাদেরকে তো স্বাধীনতার পর আইন করে, এত সভা সমিতি করে মাতৃভাষা প্রচলন করতে হয় নাই। বার্মা, চীন, ভিয়েতনাম, লাউস, ফিলিপাইন, সিংহল, মিসর, সিরিয়া, লিবিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহ বিদেশীদের দখলে ছিল। সবগুলি দেশই ১৯৪৭ সনের পরে স্বাধীনতা পেয়েছে। কৈ তাদের ভাষা তো ইংরেজি, স্পেনীশ বা রাশিয়ান বা জাপানী ভাষা নয়। সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, আরব, মধ্যপ্রাচ্য, চীন, ইন্দোনেশিয়া— তারা কী ভাষা ব্যবহার করে? আমরা ৪০/৪২ বছর যাবত কেবল সভা-সমিতি আর দাবী আদায়ের সংগ্রাম করে আসছি। শতকরা একশতভাগ স্বাধীনতা পেয়েছি প্রায় ১১/২ যুগ আগে, অথচ এখন পর্যন্ত আমরা একটা দোকানের সাইনবোর্ড মাতৃভাষায় লিখতে পারি না, বা সত্যি করে বললে বলতে হয় লিখি না। সরকার আইন করে দিয়েছে, তবু কাজ হলো কই। এরই নাম কি স্বাধীনতা? এরই নাম গণতন্ত্র? শাসনতন্ত্রের বাকস্বাধীনতা বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার কি সুষ্ঠু প্রয়োগ করছি আমরা! আমার যেহেতু ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে তাই সরকারী আইন মানব কেন? এই স্বাধীনতা কি— আমার যে ভাষা খুশী ব্যবহার করব অপরের বাধা দেবার কে? না?

সত্যি কথা বলতে কি আমাদের মন-মানসিকতা অত্যন্ত নীচ, যার জন্য আমরা অত্যন্ত সহজেই মাকে ভুলে যেতে পারি। ভুলে গিয়ে গর্ববোধ করি। বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াই 'আই রেড ইন ইংলিশ মিডিয়াম। আই নো ইংলিশ ভেরী ওয়েল'। আজ সারা ঢাকা শহর খুঁজে আপনি কয়টা দোকান পাবেন, যার সাইনবোর্ড বাংলায় লেখা? কয়টা দোকান বা প্রতিষ্ঠান আছে যার সাইনবোর্ড 'পিঠাঘর', 'আবরণী'-এর মত? শতকরা নব্বইটা বা আরো বেশী হবে দেশের দোকানপাট, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামফলক হয় বিদেশী ভাষা, নয় জগাখিচুড়ি ভাষা। বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, জীবন বীমা বা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, যোগাযোগ ইন্টারন্যাশনাল— এগুলি কি কেউ বাংলা ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড বলবেন? এগুলি হলো জগাখিচুড়ী।

সালাম, বরকত, জব্বর আর শফিউর খামোখা অকালে প্রাণ দিয়েছে। ১৯৪৮ সালে ছাত্ররা খামোখা মারামারি, ধর্মঘট আর নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারী ঘটানোর জন্য কি দরকার ছিল? ২১শে ফেব্রুয়ারী তো বাংলাদেশের ঘরে বিশেষতঃ ঢাকা শহরে সেই 'নবান্নের' মত। ২১শে ফেব্রুয়ারী তো কোন কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য পোয়াবারো; ২১শে ফেব্রুয়ারী তো কোন কোন প্রতিষ্ঠানের আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় করার সুযোগ দান করে।

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বেচ্ছাসেবী পুষে থাকেন এই দিনের জন্য এবং তাদের জন্য কয়েক হাজার টাকা প্রতি বছর ব্যয় করা হয়।) সালাম, বরকত মরে গিয়ে লাভ হয়েছে তাদের, যারা বুঝেসুঝে চলতে পারে। বাংলা প্রবাদ— 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা' ভাষার দাবীতে যারা মরেছে তারা কিন্তু 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ না করে শুভ করে দিয়ে গেছে'। আমাদের দেশে একটা গোষ্ঠী আছে যারা ছাত্রদের ব্যবহার করছে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে ছাত্ররা অধিকার আদায় করে দিয়েছে, (এখনও দিতেছে) অথচ তারা নিজেরা আজ সেই অধিকার ভোগ করতে পারছে না, ছাত্ররা আজ কলুর বলদের মত ঘানি টানছে। অথচ সেই ফুলবাবুরা, যারা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে পিছনে হাওয়া খায় তারা আজ ফফর দালালী করে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খায়, তারা আছে দুধেভাতে আর ঘুমায় নাকে তেল দিয়ে। আর ছাত্ররা কিন্তু আজো বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো অবস্থায় ঘুরে ফুটপাতে। পথে পথে ঘুরে ঘুরে তারা আজ দিকহারা, তারা পথভ্রান্ত।

"রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, আমার ভাষা তোমার ভাষা, আ-মরি বাংলা ভাষা"— এসব শ্লোগান আজ অচল। এখন হল সভা-সমিতি, সেমিনার, প্রদর্শনীর দিন। ২১ দফা, ৬ দফা, ১১ দফার মূল ছিল বাংলা ভাষা। ২১ দফার কোন একটি দফা পূরণ হয়েছে কি-না আমি জানি না। সরকারী ছুটির দিন ছাড়া কিছু বেশী হয় নাই। এতে ছাত্রদের [illegible] হয়েছে চাকুরেদের। ছাত্ররা আজো ৪০ বছর পরেও ২১শে ফেবব্রুয়ারীতে ফুটপাতে আর রাজপথেই আছে। ২১ দফার একটি দফা ছিল মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের সরকারী বাসভবনকে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করার। সেই বাসভবন এখন ফুলে-ফেঁপে অনেক মোটাতাজা হয়েছে। হয়েছে বই প্রকাশনা তথা বই-এর ব্যবসা করার উত্তম স্থান। ভাগ্য খুলেছে কিছু লেখক, শিক্ষকের বিশেষ করে, যাদের নিকটজন এই বাসভবনে সকালসন্ধ্যা বিচরণ করে। ভাগ্য খুলেছে তাদের, যারা আজ প্রাণ খুলে বই-এর ব্যবসা করতে পারে, যারা আজ সভা-সমিতির চা-নাস্তা আর চেয়ার, টেবিল ভাড়া করে আনতে পারে। এই বাসভবন ছিল বলেই না আজ মুদ্রাক্ষরিক অফিসার হতে পেরেছে। বাংলা একাডেমী না হয়ে হওয়ার কথা ছিল বাংলা ভাষার গবেষণাগার। আর এখন যা হয়েছে তা তো উপরেই বললাম। কাজের কাজ কিছুই না। ছাত্ররা এখান থেকে কি পায়? তারা তো এখন 'না ঘরকা, না বাহারকা' অবস্থায়।

বাংলা ভাষার গুরু তীর্থ বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এরা কি করছে? কঠোর ভাষা প্রয়োগ করলে বলতে হয়, এরা যেন যুক্তি করেই ছাত্রদের ডুবিয়ে দিতে চায়। আমরা সকলেই একবাক্যে সমস্বরে বলব, ছাত্ররা লেখাপড়া করে না, রাজনীতি করে। কেহ বলতে পারেন ১৭ হাজার ছাত্রের মধ্যে কয়টা ছাত্র রাজনীতি করে? শতকরা ২৫ জন (?) ছাত্রও যদি রাজনীতি করে তাহলে সকলেই ভুগছে। যদি একটি ছাত্রও করে তবু আমি বলব, কর্তৃপক্ষ দায়ী। বন্ধ থাকা অবস্থায় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি ইনস্টিটিউটে বেশ কয়দিন ক্লাস হয়েছে, পরীক্ষা হয়েছে, সবশেষে বন্ধ থাকা অবস্থায়ই সেই ছাত্রদের কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠানও হয়েছে, উপাচার্য মহোদয় ও প্রধান অতিথি ছিলেন, সেই দিন তো ছাত্ররা বন্ধ বলে ক্লাস করতে, পরীক্ষা দিতে, সার্টিফিকেট নিতে অস্বীকার করে নাই, সরকার তো বাধা দেয় নাই। তাহলে অন্য ছাত্রদের বেলায় এরূপ হতে বাধা ছিল কোথায়? আসল কথা হলো সদিচ্ছা থাকলেই হয়। কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রদের ক্লাসে ব্যস্ত রাখতে পারেন তবে তারা রাজনীতি করবে কখন? আর মায়ের ১০টি সন্তানের মধ্যে ২/১টি তো বিপথে যেতে পারেই।

সদিচ্ছার অভাব আছে বলেই ছাত্ররা আজ ভুগছে। যদি কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব না থাকবে তবে '৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যক্রম (সিলেবাস) স্নাতক (পাস) শ্রেণীর জন্য আজো বের হয় নাই কেন। এই বর্ষের ৮ মাস গত হল এখনও সিলেবাস পাওয়া যায় না। সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত অনেক পাঠ্য বইয়ের প্রকাশক বাংলা একাডেমী। কিন্তু কোন বই বাজারে আছে কি? উদাহরণ দেই— স্নাতক শ্রেণীর ইসলামের ইতিহাস বিষয়ের একটি বই সৈয়দ আমীর আলীর ইংরেজী রচনার বঙ্গানুবাদ 'আরব জাতির ইতিহাস' বইটি বাংলা একাডেমী ১৯৬৫/৬৬ সনে প্রথমম প্রকাশ করেছিল। মূল্য বোধকরি ১২/১৪ টাকা ছিল। এরপর আজ পর্যন্ত পুনঃমুদ্রণ হয় নাই। এই দীর্ঘ সময় ছাত্ররা কি পড়ছে কেউ খোঁজ রাখে না। ঢাকা শহরে যদি কেউ একটি বই পান তবে দেখবেন দোকানদার থুথু দিয়ে ঘষে মুদ্রিত মূল্য তুলে লিখে রেখেছে কয়েকশত টাকা। নীলক্ষেতে এরূপ একটি বইয়ের সন্ধান পেয়েছিলাম। সাড়ে তিনশত টাকা দিয়েও কিনতে পারি নাই। গার্হস্থ্য অর্থনীতির কোন বই সহজলভ্য নয় এবং দুষ্প্রাপ্য। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, আমরা জানি স্নাতক শ্রেণীতে বাংলায় অনেক ছেলেই ফেল করে। কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দোষের কথা বলেছেন। কিন্তু তারা হলফ করে বলতে পারবেন না যে, তারা ঠিকমত পড়ায়েছেন। কেউ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, অবিসংবাদিত সত্য যে, বাংলা বিষয়ের ১০০ নম্বরের তিনটি মূল পাঠ্য বই— প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প সংগ্রহ ধার্যকৃত নম্বর ২০ করে ৬০। তিনটি বইয়ের প্রকাশক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এর মধ্যে গল্প সংগ্রহ বইটি কেহ বাজারে বা কোথায়ও (ঔষধ খাওয়ার জন্যও) পাবেন না। প্রমাণের জন্য যে কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ সংস্থায়ও খুঁজে দেখতে পারেন।

আবদুল করিম

তাহলে ছাত্ররা ফেল করবে না কেন? এর জন্য কে দায়ী! সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমরা কিন্তু ছাত্রদের তিরস্কার করেই ক্ষান্ত হই না, তাদের মা বাবাকেও জানানো হয় আপনার সন্তান পড়ালেখা করে না। একটু খেয়াল রাখবেন। কি মোক্ষম অস্ত্র!

যাক, ছাত্ররা ফেল করলে আমার কি! করুক। আমাদের দরকার ছাত্ররা আন্দোলন করে কিছু কিছু আদায় করলে শাঁসটা যাতে পাই সেই চেষ্টায় সচেষ্ট আছে কিছু আলালের ঘরের দুলাল যারা আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হতে পারে, যারা ধামা ধরে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, গায়ে বাতাস লাগিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। আর ছাত্ররা তো ইঁদুরকপালে, আট কপালিয়া; ফেল করে আক্কেলসেলামী দিয়ে মা বাবার গলগ্রহ হবে। এরাতো এক শ্রেণীর এতিম। কেউ দেখতে পারে না। আন্দোলন করলে সকলেই খাতির-যত্ন করে, না করলেই দূরে ঠেলে দেয়।

আমাদের এ কথা বলতে লজ্জা হয় না যে, যে মাতৃভাষার জন্য তারা প্রাণ দিল সেই ভাষাতে ছাত্ররা ফেল করে। কি গর্বের কথা (?) ছাত্র সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবী এবং পরবর্তীতে বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা এবং এর দ্বারা কয়েক শত/হাজার লোকের মুখের অন্নের ব্যবস্থা হয়েছে। সেই বাংলা একাডেমী ছাত্রদেরকে তথা দেশকে কি দিয়েছে? ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বই প্রকাশ করছে না, বাংলা ভাষার চর্চা বা গবেষণা হচ্ছে না; হচ্ছে মেলা, সভা-সমিতি। তিন যুগ হয়ে এলো আজো বাংলা একাডেমী সর্বজনস্বীকৃত একটা দিনপঞ্জী চালু করতে পারে নাই, আজো এই একাডেমী একটি স্বীকৃত পরিভাষা কোষ উপহার দিতে পারে নাই। বাংলা ভাষার গবেষণা ও চর্চার জন্য একটা ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান চাই, যার আদেশ-নির্দেশ আমরা মানতে ও শুনতে বাধ্য থাকব, যেমন ছিল পূর্বে ডিআইটি-র। আজ বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য মামলা করতে হয়। কি গর্ব (?) আমাদের। এই লজ্জা কি দিয়ে ঢাকব?

একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে আমার কাছে। তাহলো বলপ্রয়োগ ছাড়া কিছু হবে না। বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, দোকানকে তাদের সাইনবোর্ড বাংলা ভাষায় লিখতে বাধ্য করতে হবে। মিষ্টি কথায় কাজ হবে না। এত দিন হয় নাই। হিসাব কষে দেখুন ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী থেকে ১৯ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত আন্দোলনের ফলে কত লোক মারা গেছে। ১৯৭১ সনের যুদ্ধকালীন মৃত্যুও এর মধ্যে ধরুন। সব মৃত্যুর মূল কিন্তু একটিই ছিল তাহলো বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা। কয়েকটা জগাখিচুড়ি প্রতিষ্ঠিত নাম যা উপরে উল্লেখ করেছি তা গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু গাদ্দাফী, ফয়সল, কিণ্ডার গার্টেন বা ইম্পিরিয়াল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ এগুলি মানা যায় না। এগুলির ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসায় অনুমোদনপত্র) বন্ধ করা উচিত। মাত্র বাহাত্তর ঘন্টার নোটিশ দিয়ে সব দোকান, প্রতিষ্ঠান মালিককে বাংলা ভাষায় নামফলক টানাতে বাধ্য করা উচিত। যেহেতু আমরা সকলেই এক জাতি— হুকুমদাতা ও হুকুম পালনকর্তা এক আত্মীয় হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। আত্মীয়তা-ভালবাসা, দয়া-মায়া মুছে ফেলে হুকুম দিয়ে তা পালনে বাধ্য করানো একান্ত অপরিহার্য। শাসনদণ্ড জানে না কোন দয়া-মায়া। তা নাহলে আগামী পঞ্চাশ বছরেও কিছু হবে না। ছাত্র আন্দোলনের লালন ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সার্টিফিকেট বাংলায় তৈরী করতে হবে। "আমি বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাব"। এই আবেদন নিয়ে ইংরেজী সার্টিফিকেট দেয়া বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজন হলে কোন দূতাবাস দ্বারা বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষান্তর দেয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শুধুমাত্র একটি ভাষায় সার্টিফিকেট দেয়া বাধ্যতামূলক করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। আর সেই ভাষাটি অবশ্যই হতে হবে "বাংলা"। কারোর যদি অন্য কোন বিদেশী ভাষার দরকার হয় তবে তাকে রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরে ভাষান্তর করে দেয়া যেতে পারে কিন্তু তা কোন মতেই সার্টিফিকেট হবে না। রাশিয়া থেকে যেসব প্রকৌশলী ডিগ্রী নিয়ে আসে তারা তো বাংলা ভাষা দূরের কথা ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় আনে না। কোন পূর্ব ইউরোপীয় বা কোন দেশই তাদের রাষ্ট্রীয়ভাষা ছাড়া সার্টিফিকেট দেয় না। আমরা কেন দেই?

আমরা হীনমন্যতায় ভুগি। আমরা নিজের টাকে সবসময় অপরের তুলনায় হেয় জ্ঞান করি। বিদেশ থেকে যা কিছু আনি না কেন বাংলাদেশে তা অতি উত্তম। এ যেন অভাবের সংসারে কচু ঘেচু যাই পাই না কেন তাই অতি উপাদেয় উত্তম বলে গ্রহণ করি। প্রকৃত ভালমন্দ বিচার বুদ্ধি আমাদের নাই। যদি থাকত তবে নিজের সন্তানকে যাকে ঘরে রেখে পালন করেছি তাকে অপর সন্তান যে বিদেশ থেকে একটা কিছু যাই ডিগ্রী আনুক তার চেয়ে হেয় জ্ঞান করি। আমাদের উচ্চ শিক্ষালয়গুলিতে এরূপ ভূরিভূরি প্রমাণ আছে যে, ১১/২/২ বছর ভারত, আমেরিকায় অধ্যয়ন করে পি, এইচ, ডি, বা যাই নিয়ে আসুক তাকে অবশ্যই ঘরের ছেলের সমডিগ্রী থাকলেও উত্তম মনে করি। বিদেশী এম, এস, ডিগ্রীধারীকে সরাসরি সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়, অথচ নিজেদের দেওয়া পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীধারীকে করা হয় অধঃস্তন প্রভাষক। নিজের সন্তানের এই অপমান যেদিন বন্ধ হবে সেই দিনই জাতীয় ভাষার সম্মান বাড়বে, উন্নতি হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক সহকারী অধ্যাপককে যার মাত্র একটি সাধারণ বিদেশী মাস্টার্স ডিগ্রী আছে; সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীধারীকে করা হয়েছে প্রভাষক। রবীন্দ্রনাথের কথা ভুলে যাই— "হে-মোর দুর্ভাগা দেশ/ যাদের করেছ অপমান/ অপমানে হতে হবে/ তাদের সবার সমান"। দেশবাসীর প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি, এটি নিসঃন্দেহে অপমানজনক। কাজেই এই ধরনের অপমান যারা করে তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই অপমান একদিন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে। আমার ছেলেকে যদি আমি সম্মান না দেই, যদি উপযুক্ত মর্যাদা না দেই তবে সেই ছেলে যদি আমাকে অবমাননা করে তবে কিছু করার থাকবে না। এ জাতীয় ব্যবহারে নিজেকে নিজে হেয় মনে করা হয়। আমদের উচিত "গেয়ো যোগী ভিখ্ পায় না" প্রবাদটিকে কার্যক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা গেয়ো যোগীকে ভিখ্ দিয়ে। এই যদি করি তবে "বাংলা ভাষার সর্বস্তরে ব্যবহার" জাতীয় সভা-সমিতি, সেমিনার করতে হবে, না। ভাষা তার নিজস্ব গতিতে, নিজস্ব স্রোতের টানে উজান-ভাটিতে চলতে থাকবে। এরূপ যদি করি তবেই বিদেশী ডিগ্রীধারী নজরুলকে বা ফররুখ আহমদকে গালি দিতে পারবে না। দেশকে ভালবাসলে, ভাষাকে ভালবাসলে যেদিন ঐ সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের যদি ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রতি ভালবাসা থাকত, তাদের যদি প্রগাঢ় দেশপ্রেম থাকত তবে কটুক্তিকারীগণ বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে শুধুমাত্র তিরস্কার পেয়ে ফিরত না। রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা ভাষার "গুরু ঠাকুর" হন তবে নজরুল অবশ্যই বাংলা ভাষার জনক। যেই নজরুল না হলে বর্তমান বাংলাদেশের বাংলা ভাষা থাকত না সেই নজরুল যদি প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায়িত হয় তবে এই লজ্জা ঢাকব কি দিয়ে।